



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 606 - 612

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘ছিন্নপত্র’র নির্বাচিত পত্রাবলি : আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধ

সুচিত্রা কড়ার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Email ID: suchitrakarar@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rabindranath
Tagore,
Chinnapatra,
Self-
consciousness,
worldly
consciousness,
Shilaidaha,
Padma,
Philosophical
consciousness.

Abstract

‘Chinnapatra’ is a unique and innovative creation in Rabindranath’s literature. The letters mentioned in ‘Chinnapatra’ have a specific path of evolution of Rabindranath Tagore’s consciousness. Rabindranath Tagore stayed in the Sajadpur-Kaligram-Patisar region in connection with the work of the zamindari. The letters he wrote during his stay in these places are included in the book ‘Chinnapatra’. ‘Chinnapatra’ and ‘Chinnapatravali’ are collections of letters written to his niece Indira Devi and friend Shrish Chandra Majumdar, published at different times. He wrote the letters during this period, 1885-1895 AD. There are about 153 letters in this collection. This collection is named ‘Chinnapatra’ because some parts of these letters were omitted for the purpose of publishing them in book form, hence the collection of these letters has been named ‘Chinnapatra’. The poet’s beauty-thirsty nature is seen here in the intense taste of nature, the beloved imagination of Padma and the joy of solitude. He absorbed beauty. The limits of this self-consciousness were crossed by his deep sympathy for worldly life and listening to the sufferings of ordinary people. Gradually, when a bridge of humanity was built between his self-consciousness, the consciousness of homeland, and the consciousness of the universe, Rabindranath’s world-consciousness came to its fullness. The major trend in Rabindranath, the worshiper of world humanity, was the romantic trend and Another trend was the combination of divine feeling which originated from colonial thought and later gave another dimension to Rabindranath’s literature. This trend has expanded not only in Bengali literature but also in other literatures after Rabindranath. The trend of worldly consciousness is seen in several of Rabindranath’s poetic works, such as ‘Balaka’, ‘Sonar Tori’, and ‘Chitra’. The consciousness of worldly consciousness that was awakened through the poetic works is reflected in the letters of Chhinnapatra. The present article discusses an example of his transition from self-consciousness to worldly consciousness.

Discussion

উনিশ শতক ছিল বাঙালির ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের। এই সময়ের বাঙালির অবক্ষয়ের ইতিহাসকে সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের আত্ম উপলব্ধি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে বিশ্ববোধের দিকে। বিশ্ববোধ রবীন্দ্রনাথের শৈশব সঙ্গী, তাঁর একটি বিখ্যাত লাইন – ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’। রবীন্দ্রনাথের গানেও বিশ্ববোধের একই ছবি, ‘হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে’। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে বাংলার প্রকৃতি এবং বাংলার মানুষের মধ্যে। ‘ছিন্নপত্র’-এর পত্রগুলির রচনাকাল মোটামুটি ১৮৮৫-১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যৌবনদীপ্ত রবীন্দ্র মনের অনুভূতির সরল, ভনিতা-বিহীন প্রকাশ এই চিঠিগুলি; কারণ প্রায় চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে চিঠিগুলি লেখা। স্বাদে-বৈচিত্র্যে চিঠিগুলি ঠিক চিঠি নয়, রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে লিখতে অনায়াসে গল্প বলেছেন। শিলাইদহ পর্বের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তাঁকে অধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক চেতনার বিবর্তন ‘ছিন্নপত্র’এর চিঠিগুলিতে একটি অপরিহার্য দলিল হয়ে উঠেছে। এই পর্ব কবির জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অধ্যায়, তা শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। তিনি সেই সময় শিলাইদহ অঞ্চলে জমিদারির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা শহরটিকে তাঁর লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality’র দুর্গের মধ্যে বন্দীর সমান মনে হত। শিলাইদহের পরিবেশ তাঁকে অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, খোলা মাঠ, শান্তি দান করেছিল। এই পরিবর্তন তাঁর ব্যক্তিগত, সীমিত চেতনার কাঠামোকে ভেঙে অসীম, বিশ্বজনীনতার সঙ্গে আলাপ করিয়েছিল। যা তাঁর আত্মিক অনুসন্ধানের অপরিহার্য হয়েছিল। কবিতা বা নাটকের আড়াল না থাকায়, চিঠিগুলিতে কবির মনের অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকাশ ছিল। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে সাহিত্যের সবদিকে, গল্প-কবিতা-কাব্যনাট্যে-চিঠি-প্রবন্ধে উৎসারিত করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে ভরা ছিল প্রত্যেকটি চিঠি। তাঁর বক্তব্য, -

“কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের মধ্যে সহজ-সরল সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে যেন বলতে পারি আমি ধন্য।”

জীবন ও শিল্প, শিল্পীর কাছে অখণ্ড সত্তা। রবীন্দ্রনাথকে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন ‘জীবনশিল্পী’, কারণ শিল্পীর মতো তিনিও জীবনকে বন্দনা করেছেন। জীবন কী করে কাব্য হয়ে উঠে, সৃষ্টির এই আশ্চর্য অভিব্যক্তির স্পষ্ট ছবি একমাত্র ‘ছিন্নপত্র’তেই আমরা পাই। পদ্মাতীরের পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা তিনি বিভিন্ন সময়ের চিঠিতে লিখেছেন। পদ্মার ঘাটে ঘাটে, তার অগাধ বিস্তৃত চরের নিঃশব্দতায় বসে তিনি পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যসুখা পান করেছেন, কবির অন্তরের এই গভীর অনুভূতি আজও সত্য বলে মনে হয়। কুঠিবাড়িতে সরল-সহজ গ্রাম্য মানুষদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার সান্নিধ্যে এসে, ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে তিনি প্রতিদিনের ভাবনাচিন্তা-সুখ-দুঃখ-রহস্য-কৌতুকের জাল বুনেছেন। যেখানে কোনো জরুরি তলবের তাড়া ছিল না তাই তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়েছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে। এখানে বসেই তিনি বিশ্বকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করেছেন; তাই বলে ঘরকে ভাঙেননি। এই জীবনসাধনাই তাঁর সকল কাব্যসৃষ্টির উৎস, ‘ছিন্নপত্র’ তারই সার্থক নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর একটি উক্তি গ্রহণযোগ্য, -

“প্রাণের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অপ্রমত্ততা, অনুভবের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধের আশ্চর্য সমন্বয় ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে প্রকাশিত।”^২ (ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রদর্শন)।

‘ছিন্নপত্র’ পড়লেই আমরা বুঝি, কবি তাঁর অন্তরের কথাকে চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশে উজ্জ্বল, যা পাঠকচিহ্নেও নিভৃত আনন্দ সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-বিবর্তনের ইতিহাসে ‘ছিন্নপত্র’-এ উল্লিখিত চিঠিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কবির আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্যচেতনা অর্থাৎ আত্মবোধ বৃহত্তর সৃষ্টি ও মানবজীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে বিশ্ববোধে উত্তরণ করেছে। আত্মবোধ বলতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়কে বোঝায়, কবি মূলত প্রকৃতির রূপমাধুর্যকে তাঁর ব্যক্তিগত

অনুভূতির প্রতিচ্ছবি এবং রস আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। যেখানে বহির্জগৎ ছিল কবির ব্যক্তিগত আনন্দ বা নেশার উপকরণ মাত্র। এই অবস্থায় মানুষ তার নিজস্ব সুখ-দুঃখ, আবেগ এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকে। পত্রাবলির প্রথম দিকে এই আত্মবোধের প্রবণতা প্রবল, সেখানে বহির্জগৎ কেবল ব্যক্তিগত ভাবনার প্রতিচ্ছবি। পক্ষান্তরে, বিশ্ববোধ চেতনার চরম পরিণতি, যেখানে কবির ব্যক্তিসত্তা মহাবিশ্ব ও বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। এই পর্বে সৌন্দর্য মানসিক আনন্দ রূপে না থেকে, তা কবিসত্তার সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রূপে উপলব্ধ হয়। এখানে লেখকের আত্মকথন, ব্যক্তিগত পত্রের সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীনতায় পৌঁছায়। চিঠিতে প্রকাশিত অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিই বিশ্ববোধের ভিত্তি তৈরি করেছে। বিশ্ববোধ হল আত্মবোধের সম্প্রসারণের ফল, যা cosmic consciousness বা অদ্বৈতবোধ দ্বারা চিহ্নিত। রবীন্দ্রসৃষ্টির অঙ্কুর স্বরূপ; পত্রগুলিতেই ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’ এবং ‘চিত্রা’ কাব্যের নান্দনিক চেতনা এবং ছোটগল্পের সামাজিক উৎস নিহিত রয়েছে। বস্তুত তাঁর সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন মানবজীবনের অন্তরঙ্গ বিষয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের এসেছিল শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসরে জমিদারি পরিদর্শনের সময়ে।

শিলাইদহের প্রাকৃতিক পটভূমি কবির প্রকৃতিচেতনা, মর্ত্যপীতি বা মানবচেতনার মূল উৎস। চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর প্রায় দশ বছর তিনি কাটান পদ্মার তীরে। পদ্মার তীরে অবস্থিত শিলাইদহ এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। পদ্মা, গোরাই, আত্রাই, যমুনা (ব্রক্ষপুত্র)-সহ অসংখ্য নদনদী দ্বারা লালিত ছিল ভূভাগ। রবীন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টি এবং কর্মশক্তির প্রেক্ষাপট ছিল মূলত প্রকৃতি ও মানবচেতনা। যেখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানবের অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ পেয়েছিলেন। একদিকে পদ্মার বুকে বোটে ভাসমান নির্জনতা তাঁকে নিবিড় আত্মদর্শনের সুযোগ দিয়ে আত্মবোধকে গভীর করে, অন্যদিকে জমিদারি পরিচালনার কাজ তাঁকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে বাধ্য করে। এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির টানাপোড়েনই আত্মবোধের সীমা ভেঙে বিশ্ববোধের দিকে চালিত করে। প্রকৃতির মহিমা মূলত কবির ব্যক্তিগত ‘আমি’র আনন্দলীলার উপকরণ হিসেবে কাজ করত। এই রসানুভূতি বিশ্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করলেও, সৌন্দর্যের প্রতি ব্যক্তিগত নেশা ও ইন্দ্রিয়-আনন্দন করেছিলেন। কবির সরাসরি ঘোষণা —

“সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি সত্যি খেপিয়ে তোলে।”^৩

সৌন্দর্যকে ‘নেশা’ বা ‘intoxication’ রূপে বর্ণনা করার অর্থ হল, এই আনন্দ চরমভাবে আত্মগত এবং তীব্র ছিল। এই মগ্নতা কবিকে বাহ্যিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের চেতনার জগতে ডুবিয়ে দেয়। এই তীব্রতা, যদিও গভীর, মূলত আত্মতৃপ্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তিনি চারপাশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগ করেছেন— নদী, খাল, বিল, তাল-নারিকেলকুঞ্জ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সমারোহ। তাঁর অনুভব —

“এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই সব বর্ণ গন্ধ গীত।”^৪

আত্মবোধের প্রধান প্রকাশ প্রকৃতির উপর মানবধর্মের আরোপ। শিলাইদহ পর্বে পদ্মা নদী না থেকে মানবীসত্তা নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। কবি পদ্মাকে প্রিয়া হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্বেও পদ্মা স্মৃতির সৌন্দর্যে লাভাণ্যময়ী রূপেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। এই অন্তরঙ্গতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে —

“যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।”^৫

পদ্মাকে ‘চিরচঞ্চলা’, ‘চিরগতিমুখরা’ রূপে বর্ণনা করা। কবি নিজের অনুভূতিকে প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করে মানবীয় প্রিয়ার স্থান দিচ্ছেন। এটি আত্মবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ, যেখানে বস্তুগত সত্তা আত্মগত ভাবনার পাত্র পরিণত হয়। নির্জন নদীতীর ও গ্রামকে যখন সন্ধ্যা আচ্ছন্ন করে, তখন কবির মনে হয়, ‘এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ’। এই ‘রূপকথার জগৎ’ বাস্তবের জটিলতা ও যন্ত্রণা থেকে আত্মসত্তাকে রক্ষা করে। প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও যখন তিনি বোটে একা সৌন্দর্য উপভোগ করতেন, তাঁর একাকীত্ব তাঁকে গভীর আত্মদর্শনের সুযোগ দিলেও, মানুষের উপস্থিতি বিচ্ছিন্নতা তাঁকে রোমান্টিক মগ্নতায় পরিণত করত, যা বিশ্ববোধের দিকে উত্তরণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

আত্মবোধের প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তি তার পরিধি থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির দিকে মুখ করে, কিন্তু তখন বিশ্বকে কেবল সুন্দর উপাদান হিসেবে দেখে। পত্র ১০ ‘ছিন্নপত্র’ এর শুরুর দিকের লেখা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে সাধারণত প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা এবং সেই বর্ণনাকে ব্যক্তিগত অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যেমন, আকাশের পূর্বদিকে -

“অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতায়, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা; আর উপরে অশরীরী উদার সূন্যতা।”^৬

আবার -

“স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ওপারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যা-সূর্যালোক আশ্চর্য স্বপ্নের মতো।”^৭

আত্মবোধের প্রকাশ এখানে প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়, প্রকৃতি লেখকের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে একটি বস্তু হিসেবে। এই স্তরে বিশ্ববোধের যাত্রা শুরু হয় নিছক পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সীমহীন মন বাইরের বস্তুকে নিবিড়ভাবে লক্ষ করার মাধ্যমে তার সীমালঙ্ঘনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই পত্রে বহির্বিশ্বকে আর কেবল বস্তু হিসেবে নয়, বরং গভীরতর চেতনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার শিক্ষা শুরু হয়। যেখানে তিনি জানান, -

“পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপর প্রতি রাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারের এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।”^৮

জগৎ-এর রহস্য সন্ধানী মন ধীরে ধীরে বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পত্র ১৮-তে কবির চেতনা প্রবাহের দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত করেছে। এখানে সামঞ্জস্য বা চিরন্তন গতির মধ্যে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবস্থান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নারীর সঙ্গে পৃথিবীর এক যোগ তৈরি হয়েছে। তাঁর কাছে পৃথিবী জড় বস্তু নয় এক প্রাণবান অস্তিত্বের বস্তু, যাতে বিশ্ববোধের চরম লক্ষণ রয়েছে। এখানেই আত্মবোধের সংকট শুরু, অন্তর্হীন তার আত্মপরিচয়কে কবি ধরে রাখতে চান, কিন্তু নদী, প্রকৃতি এবং সময়ের অবিরাম পরিবর্তনের মুখে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর ফলে, আত্মসত্তা তার পরিচয়কে স্থিরতার বদলে অস্তিত্বের জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে খুঁজতে শুরু করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার পরিচয় অনন্য হলেও তা সমগ্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় — এটি সত্তা-ভেদে-অভিন্নতার ধারণায় নিয়ে যায়। পত্র ১০-এ কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভূত হচ্ছিল, পরে পত্র ১৮-এ সেখানে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গঠনমূলক নীতি বুঝতে পারি। এখানে সীমিত ভাবে অহং-এর কাঠামোর মধ্যে প্রথম ফাটল তৈরি হয়।

বিশ্ববোধের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে সেই দার্শনিক উপলব্ধিগুলিতে, যেখানে কবি নিজেকে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে জৈবিকভাবে এক অনুভব করেন। পত্র ৩০ জীবন-শক্তির সন্ধিক্ষণের পত্র। এখানে বাহ্যিক নিরীক্ষণ থেকে সরে এসে আত্মিক নিয়ন্ত্রণের দিকে কবি মনোযোগ দেয়। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ সীমাহীন ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেন। ব্যক্তির ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও জীবন বৃহত্তর, অনিয়ন্ত্রিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্তরে আত্মবোধের প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত ভাগ্য বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার হতাশা বা কষ্টের মাধ্যমে। কিন্তু বিশ্ববোধের যাত্রা শুরু হয় এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যে, সর্বোচ্চ আনন্দ নিহিত থাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সেই বৃহত্তর জীবন-শক্তির কাছে সমর্পণ করার মধ্যে। এই শক্তি ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হলেও তা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে। এই দার্শনিক স্বীকৃতি ব্যক্তিগত ‘আমি নির্বাচন করি’ থেকে ‘আমি নির্বাচিত’ হওয়ার মানসিকতার উত্তরণ হয়। পত্রের সার্বজনীন জীবন-স্পন্দনের ধারণা পরবর্তীকালে পত্র ১০২-এ অহং-এর দার্শনিক বিলুপ্তির ধারণাকে অনিবার্য করে তোলে। এই সময় কবির ছোটগল্প সংকলন ‘গল্পগুচ্ছ’ রচনার সূচনাকাল। শিলাইদহে জমিদারির কাজ তদারক করার সময় তিনি সরাসরি বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর বিশ্ববোধকে

প্রসারিত করে। এখানে আত্মবোধের আরামের মগ্নতা থেকে বেরিয়ে মানুষের দুঃখের মুখোমুখি হন কবি। এই পর্যায়ে বিশ্ববোধ শুধুমাত্র মহাজাগতিক ঐক্য বা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় সীমাবদ্ধ না থেকে তার সম্প্রসারণ করে। এই বিশ্বজনীন শক্তি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মিক পথনির্দেশক না থেকে বরং সামাজিক দায়িত্ববোধের উৎস হয়। এই মানবিক সংযুক্তিই রবীন্দ্র-দর্শনের সার্বজনীন মানবতাবাদ রূপ নেয়।

এই উত্তরণের সর্বোচ্চ বিন্দুটি চিহ্নিত হয় ৬৪ সংখ্যক পত্রে, যেখানে ব্যক্তিসত্তা বিশ্ব-আমি'তে লীন হয়ে যায়। তিনি অনুভব করেন তিনি বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি থেকে দূরে এক জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে বাস করছেন। এই পরিবেশে তাঁর চেতনার সঙ্গে পৃথিবীর এক নতুন মেল বন্ধন। যা বিশ্ববোধের মূর্ত প্রতীক –

“এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান।”^{১০}

‘নাড়ীর টান’ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি জৈবিক এবং জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করেছে। এই উপলব্ধিতে কবির প্রকৃতিপ্রেম সৌন্দর্যভোগ বা কাব্যিক কল্পনা নয়, বরং জড় ও জীবজগতের সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা বিদ্যমান। এই অনুভূতি কবির চেতনার সর্বোচ্চ বিন্দু - ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ও চেতনার সঞ্চারণ। বিশ্ববোধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত ‘আমি’র বিলোপ এবং বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে একাত্মতা। তিনি অতীতের স্মৃতিচারণ করেন –

“এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উথিত হতে থাকত।”^{১১}

এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে কবি আবেগ বা কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার সেই বিলোপের ছবি রয়েছে। যেখানে ব্যক্তিগত সত্তার সীমারেখা মুছে যায়। এরপর চূড়ান্ত উপলব্ধি হয় –

“... আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে...”^{১২}

যদি চেতনা পৃথিবীর প্রতিটি ঘাস এবং শিকড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, তবে ব্যক্তিগত আত্মবোধের অস্তিত্বগত বাধা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রকাশ পায় অনুভূতি এবং সৌন্দর্যের অনন্তরূপ। বিশ্ববোধে উপনীত হওয়ার পর সৌন্দর্য কবির কাছে আর নিছক ‘নেশা’ নয়, তা ‘সত্তালোপকারী অনুভূতি’। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অহংবোধকে বিলুপ্ত করার ক্ষমতা রাখে এই সৌন্দর্য। এটি ক্ষণস্থায়ী আনন্দ নয়, শূন্যকে পূর্ণ করার মতো চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক পূর্ণতা। এই পত্রে কবি সম্পূর্ণ বিলীনতা এবং স্বচ্ছতার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন, যেখানে চেতনা হবে সুবিস্তৃত এবং মন-শরীরের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।

পত্র ৭৭ আদিম আত্মীয়তার সঙ্গে মহাজাগতিক আত্মপরিচয়ের পত্র এটি। এই পত্রে কবি সমুদ্র ও পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর ‘বহুকালের গভীর আত্মীয়তা’ অনুভব করার কথা বলেন। আত্মবোধের প্রকাশ এখানে হয় নিজের অন্তঃসমুদ্র নিয়ে গভীর আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে – সেই অস্থির হৃদয়, যা –

“... আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে।”^{১৩}

তিনি উপলব্ধি করেন যে – পৃথিবীর সৃষ্টির আদিমকালে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একা ছিল, তখনো তাঁর আজকের এই চঞ্চল হৃদয় সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে “অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত।”^{১৪} এই উপলব্ধি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিশৃঙ্খলাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলে। এটি সীমাহীন আত্ম এবং বিশ্বসত্তা – এই দুয়ের মধ্যকার দেশগত এবং কালগত বিভেদকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়। এই পত্রটি পত্র ৩০-এর দার্শনিক ধারণার অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ। অন্যদিকে, পত্র ১০২-তে কবির ‘আত্মবোধের’ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই চিঠি ‘আত্মবোধ’ থেকে ‘বিশ্ববোধ’-এ উত্তরণের চূড়ান্ত দার্শনিক ভিত্তি। আত্মাকে যন্ত্র হিসেবে উপলব্ধি – যা অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান। এটি ছিন্নপত্র-এর দার্শনিক শিখর। এখানে মানব মনের রহস্যকে

প্রকৃতির বিশাল, অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আত্মবোধের প্রকাশ ঘটে গভীর জিজ্ঞাসা এবং স্বাধীন কার্যকলাপের প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে। কবি তাঁর নিজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (স্নায়ু, রক্তপ্রবাহ, মস্তিষ্ক) নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা স্বীকার করেন এবং প্রশ্ন তোলেন, -

“আমার ক্ষেত্রে এই ভয়ংকর রহস্য যোজনা করে দেবার কী প্রয়োজন ছিল?”^{১৪}

এই আত্মসমীক্ষা অহং-এর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মাকে একটি ‘সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মত’ বলেন। যার ভিতরে অনেক তার ও কলকজা আছে, কিন্তু সচেতন ‘আমি’ কেবল এটাই জানে যে কী বাজছে (সুখ না দুঃখ, কড়ি না কোমল), কিন্তু কে বাজাচ্ছে তা জানে না। এই রূপকের মাধ্যমে অহং সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং আত্ম চেতনার প্রকৃত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করে যে দার্শনিক মুক্তি অহং-কে প্রসারিত করার মাধ্যমে নয়, বরং তার সার্বভৌমত্বের দাবিকে মুছে ফেলার মাধ্যমেই থাকে। এটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে অনন্তের দিকে স্থানান্তরিত করে। পত্র ১০৬ বাস্তবতা ও অদ্বৈতবোধের প্রতিষ্ঠার পত্র। আত্মবোধ এখানে শান্ত। ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা এখন মহাজাগতিক কাহিনির একটি অংশ হিসেবে গৃহীত। বিশ্ববোধের পথরেখা এখানে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে— যা সীমাহীন, আনন্দময় অনন্তের মধ্যে অস্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। এটি হলো অদ্বৈতবোধের, একটি স্থিতিশীল অবস্থা, যেখানে আত্মসত্তা অনন্তের মধ্যে তার পূর্ণতা খুঁজে পায়। এই বিশ্ববোধে মহাজাগতিক সংযোগ (পত্র ৭৭) এবং মানবীয় দায়িত্ব (পত্র ৬৪) একসঙ্গে মিশে যায়, নিশ্চিত করে যে অধ্যাত্মিকতা আরোহণ মানব জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণ হয়। তিনি উপলব্ধি করেন এই ‘বিশ্ববোধ’ শুধুমাত্র প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানুষের প্রতি প্রেম বা ‘মর্ত্যপ্রীতি’।

পত্র ১০ হল বিশ্ববোধের গতিপথে প্রাথমিক পত্র। পত্র ১৮-এ আত্মবোধের পরিবর্তনশীলতার মাঝে স্থির আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেন কবি। বিশ্ববোধের পথে জৈব ঐক্যের স্বীকৃতি; সত্তা-ভেদে-অভিন্নতার উপলব্ধি ঘটায়। পত্র ৩০ ব্যক্তিগত ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা ও কষ্টের স্বীকারোক্তির পত্র। তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বৃহত্তর, নৈর্ব্যক্তিক জীবনের কাছে সমর্পণ করেন। নিজে সার্বজনীন স্পন্দনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৬৪-এ ব্যক্তিগত আরাম ছেড়ে সামাজিক দুর্দশার মুখোমুখি হন। মানবতাবাদ ও সামাজিক সংবেদনশীলতা দেখা যায়। ৭০-এ ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও সীমানার বিরুদ্ধে গভীর অধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখা যায়। ৭৭-এ মানব হৃদয় এবং আদিম প্রকৃতির মধ্যে গভীর আত্মীয়তা এবং মহাজাগতিক পরিচয়ের অভিজ্ঞতা দেখা যায়। ১০২-এ আত্মকে ‘সজীব পিয়ানো যন্ত্র’ হিসেবে উপলব্ধি। অহং বিলুপ্তির মাধ্যমে আত্ম প্রতিষ্ঠা হয়। ১০৬ স্থিতিশীল, সংঘাতমুক্ত অবস্থা। মহাজাগতিক ও নৈতিক বিশ্ববোধের চূড়ান্ত একীকরণ। অদ্বৈতবোধের প্রতিষ্ঠা। এই পত্রগুলিতে কবির চেতনার যে ধারাবাহিকতা প্রকাশিত হয়েছে, তা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ইতিহাস নয়, বরং তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মের মূল ভিত্তি। এই মানবিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত আনন্দের সীমা ভেঙে বৃহৎ, কর্মময় জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল। সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবজীবনের শ্রম ও দুঃখকে একীভূত করার মাধ্যমেই আত্মকেন্দ্রিকতা ঘুচে যায়। বিস্তৃত পরিসর শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বসাহিত্যের আড়িনায় এই বিশ্ববোধ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। একটি মানুষের পক্ষে কীভাবে বিশ্বজনীন সত্য এবং ঈশ্বরের একত্বের সন্ধান সম্ভব, তার একটি অনন্য দলিল।

Reference:

১. সিন্ধা, বিদিশা, ‘নির্বাচিত ছিন্নপত্র’, অক্ষর প্রকাশনী, ১৮-এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৩১
২. তদেব, পৃ. ২১
৩. তদেব, পৃ. ৫১
৪. তদেব, পৃ. ৪৭
৫. তদেব, পৃ. ৪৯

-
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্র', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ
১৩১৯, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬২ কার্তিক, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ৩২
৮. তদেব, পৃ. ৩২
৯. তদেব, পৃ. ১৩৯
১০. তদেব, পৃ. ১৩৯
১১. তদেব, পৃ. ১৩৯-১৪০
১২. তদেব, পৃ. ১৫৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৫৯
১৪. তদেব, পৃ. ২০৭